বৈষম্যের নির্ঘণ্ট

২২ নভেম্বর ২০২০

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর নির্যাতনের ধারা অব্যাহত। কিছুদিন আগে ইছামতী-র ঘটনার পর খোদ শিলং এ নিগৃহীত হয়েছেন কিছু বাঙালি যুবক। সম্প্রতি আবার ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যানার লাগানো হয়েছে। লক্ষ্য সেই সংখ্যালঘু বাঙালি জনগোষ্ঠী। এই জাতিবিদ্বেষের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা ইত্যাদি নিয়ে গোবিন্দ ভট্টাচার্যের ইংরেজিতে লেখা একটি প্রবন্ধ 'A discriminating schedule' এই শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'The Pioneer' পত্রিকার ১৬ নভেম্বর সোমবারের এডিশনে। প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ন মনে হওয়ায় এটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়...

মেঘ আর বৃষ্টি এখানে খেলা করে বছরভর। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি চাটুজ্যে তাই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' রাজ্যটির নামকরণ করেছিলেন ' মেঘালয়'।

কিন্তু এখনএই পাহাড়ি রাজ্যে বৃষ্টির মতোই বাজার হাটে,রাস্তার মোড়ে, অলিতে গলিতে অসংখ্য ব্যানার, পোস্টার পড়ছে, যা আবার রাজ্যের সংখ্যালঘু বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেইসব ভয়ঙ্কর দিনের কথা, গনহত্যার কথা যা বারবার সংগঠিত হয়েছে রাজ্যের অনুপজাতি, বিশেষতঃ বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। রাজধানী শিলং এ আবার চলছে সেই পুরোনো প্রচার - **"All Meghalaya Bengalies are Bangladeshis" বা " Khasiland for Khasis, Foreigners go away"**

কারা এইসব আওয়াজ ওঠাচ্ছে ? এগুলো সবই খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা কে এস ইউ র উদ্ভাবন। এটি সেই ছাত্র সংগঠন যারা জন্ম থেকে আজ অবধি রাজ্যে যত জাতি বিদ্বেষ, গন হিংসা, দোহন, লুঠ, অগ্নিসংযোগ হয়েছে তার জন্য দায়ী। এবং তাদের মূল নিশানা অনুপজাতি জনগোষ্ঠী। মেঘালয় সরকার পোস্টারগুলোকে আপাতত সরিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু যারা এসবের পিছনে তাদের ছিটেফোঁটা শাস্তি ও হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা শুধু মৃদুস্বরে একবার শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন কে এস ইউ কে অর্থাৎ সেই ছাত্র সংস্থাকে যাদের কাছে শান্তি মানে অনুপজাতি দের কাছ লুঠ কিম্বা গনহত্যা যার জেরে অনুপজাতিরা অনেক আগেই এই রাজ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত হয়েছেন। দেশের অন্যপ্রান্তের নাগরিকদের যে সব সাংবিধানিক অধিকার বা স্বাধীনতা রয়েছে,যাকে মৌলিক অধিকার বলা হয়, তা থেকে কিন্তু বঞ্চিত মেঘালয়ের সংখ্যালঘুরা। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল ১৬, সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সমঅধিকারের কথা বলে তা কিন্তু সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়না এই রাজ্যে।

© Ishan Kotha

মেঘালয়, যার মূল বাসিন্দা খাসি, জয়ন্তিয়া এবং গারো জনগোষ্ঠী তা আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ১৯৭২ সালে। কিন্তু নতুন রাজ্যের জন্মলগ্ন থেকেই ৮৫% সরকারি পদ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এর ৪০% খাসি এবং জয়ন্তিয়া দের জন্য, ৪০% গারোদের জন্য এবং বাকি ৫% অন্যান্য উপজাতি/জনজাতি দের জন্য সংরক্ষিত ভারতীয় সংবিধানের ১৬(৪) ধারা অনুযায়ী। কিন্তু বরাদ্দের বাকিটা অর্থাৎ যে ১৫% তাও অনুপজাতিদের ভাগ্যে জোটে না। এমনকি বেসরকারি যেসব উদ্যোগ এককালে মেধাবী অনুপজাতি শিক্ষক, অধ্যাপকদের নিয়োগ করত কে এস ইউর চোখ রাঙানোতে তাও আজকাল বন্ধ। বিখ্যাত মিশনারী স্কুল ,কলেজ যারা উৎকর্ষতা কে প্রাধান্য দেয়, তারাও, ছাত্র সংস্থার হুমকিতে, একবার নিয়োগ করে তা পরে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে সেরকম উদাহরণও রয়েছে।

একইভাবে সংবিধানের ধারা ১৯ নাগরিকদের দেশের যে কোনো অংশে বসবাস করার, যে কোনো পেশা বা ব্যাবসা, বানিজ্য ইত্যাদি করার যে অধিকার দিয়েছে, যা আমাদের মৌলিক অধিকার হিসেবেও স্বীকৃত অনুপজাতিদের ক্ষেত্রে তাও প্রযোজ্য হয়না এই রাজ্যে। বসবাস অর্থাৎ জমি কেনা বেচার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়ে, এবং যে কোনো পেশায় নিয়োজিত হবার অধিকার গেছে যবে থেকে সংবিধানে 'সিক্সথ সিডিউল' এর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। এই বিশেষ ধারাটির ইতিহাস সেই ঔপনিবেশিক সময় থেকে যা অসম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ সংস্থান হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। এই ধারাটি এইসব এলাকাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার বিধান দিয়েছে যার দ্বারা স্থানীয়রা অন্য সবকিছুর সাথে নিয়োগ, পেশা, জমির ব্যাবহার, বনাঞ্চল এবং কৃষিভূমির ব্যাবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ আইন তৈরি করতে পারেন। এই সিডিউলের ১০(ঘ) উপধারা অনুযায়ী কোনো অনুপজাতি যদি এইসব এলাকাতে ব্যাবসা বানিজ্য করতে চান তবে তার জন্য স্বশাসিত পরিষদ থেকে অনুজ্ঞা পত্র বা লাইসেন্স সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। আর মেঘালয়ের মতো রাজ্য যেখানে জাতিবিদ্বেষের চাষ করা হয় সেখানে লাখ লাখ টাকা ঘুষ না দিলে যে তা পাওয়া যাবেনা তাই বলা বাহুল্য। কিন্তু অনুপজাতি ব্যাবসায়ীদের সেই সঙ্গতি কোথায় ? তাও যারা পারেন, তাদের সেই কষ্টার্জিত অর্থে কে এস ইউ র উদরপূর্তি হয়। এবং এইসব ছাত্রসংগঠনের আয়ের একটু মুল উৎস এইসব অনুপজাতি পেশাদার এবং ব্যাবসায়ীরা যাদের কাছে মাসিক ভিত্তিতে এইধরনের সেলামী সংগ্রহ করা হয়। "শুধু পেশা চালিয়ে যাবার স্বার্থে এইসব ছাত্র সংগঠনকে মাসিক ২৫,০০০ টাকা অব্দি উৎকোচ দিতে হয়" - এমনটাই জানিয়েছেন স্থানীয় এক অনুপজাতি ডাক্তার। যদিও ৪১ধারা অনুযায়ী কাজের অধিকার সংবিধানের নির্দেশক নীতিমালা **(Directive principle)** র অধীনে তালিকা ভুক্ত, কিম্বা জীবিকার অধিকার ধারা ২১ অনুযায়ী জীবনের অধিকারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং যা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ে **(2011(1)SCC 53, (2014) 14 SCC 127, 2016(6) RAJ 306, (2016) 2 SCC 123** ইত্যাদি) স্পষ্টত উঠে এসেছে তা কিন্তু মেঘালয়ের অনুপজাতিদের কাছে উপলব্ধ নয়।

আর্টিকেল বা ধারা ১৩(২) অনুযায়ী কোনো রাজ্য এরকম কোন আইন বানাতে পারেনা যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কে খর্ব করে। কিন্তু সিক্সথ্ শিডিউল নাগরিক দের স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করছে এবং সেই ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে। রাজ্যপালের বিবেচনা মূলক ক্ষমতা **(discretionary power)** এর সীমারেখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট **Pu Myllai Hlycho & others vs State of Mizoram & others, 2015** কেসটির ফয়সালা করতে গিয়ে যে রায় দেন তাতে বলা হয়েছে "এটা বলা হয়ে থাকে যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল গুলি সিক্সথ্ শিডিউল এর সংস্থান অনুযায়ী চালিত হবে। কিন্তু আবেদনকারীর এই যুক্তি বিভিন্ন কারণে গ্রহনযোগ্য নয়। সিক্সথ শিডিউলও সংবিধানেরই একটি অংশ এবং সংবিধানের অন্য ধারাগুলিকে ভুলে গিয়ে এটির ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সিক্সথ্ শিডিউল কে সংবিধান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা বা দেখা অসম্ভব। এই ধারাকে সংবিধানে সংযোজনের পিছনে একটি আইনি ইতিহাস অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তারজন্য এটাকে সংবিধানের মধ্যে আরেকটি সংবিধান বলে ভাবা ন্যায়সঙ্গত নয়।" যদিও উক্ত রায়ের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যার্থ হয়েছেন এইসব রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা যা বারবার বিভিন্ন সরকারি কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বা হচ্ছে।

কবে এবং কিভাবে অনুপজাতিরা মেঘালয়ে এসেছেন এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই প্রসঙ্গে বুঝে নেওয়া জরুরী। ১৯ শতকে বৃটিশ রাজ তাদের প্রসাশনিক কাজকর্ম চালানোর স্বার্থে বাঙালিদের শিলং এ নিয়ে আসার উদ্যোগ নেন। তখন শিলং ছিল অবিভক্ত আসামের রাজধানী। এর প্রধান কারণ ভারতীয় মধ্যে এই জনগোষ্ঠীই প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন। এবং তারপর থেকে এরা বংশানুক্রমিক ভাবে এই রাজ্যের বাসিন্দা। সিলেট জেলা, যা তখন আসামেরই অংশ তার সাথে পার্শ্ববর্তী এলাকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেইসব এলাকা নিয়েই পরে তৈরী হয় মেঘালয় রাজ্যটি। সিলেটের বাঙালিদের সাথে ১৯ শতকের প্রথম থেকেই ব্যাবসা বানিজ্য বা অন্যান্য বিনিময়ের সুত্রে পার্শ্ববর্তী খাসিদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে দেশভাগের বিপর্যয়ের শিকার হয়ে যখন বাঙালি হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন তখন তাদের অনেকেই শিলং কে দ্বিতীয় বাসভূমি হিসেবে বেছে নেন। শিলং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ব্যাবসায়িক উন্নতির পিছনে এই ছিন্নমূল বাঙালিদের প্রচুর অবদান রয়েছে এবং মূলতঃ তাদের জন্যই শিলং এককালে উত্তর পূর্বের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ সরকার পরবর্তীতে কায়িক শ্রমভিত্তিক শিল্প তৈরির তাগিদে বিহারী এবং নেপালী জনগোষ্ঠীর লোকদেরও শিলং এ প্রতিস্থাপিত করে এবং এরাও এরপর থেকে বংশানুক্রমে এখানে বসবাস করছেন এবং রাজ্যের উন্নতিতে অবদান রেখে চলেছেন। কিন্তু মেঘালয় আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য হওয়ার পরই এরা কিন্তু শুধু তাদের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান থেকে চ্যুত হননি, তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেয় থাকবার অধিকারও হারিয়েছেন।

ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা এভাবে শেষ হওয়ায় অনুপজাতিরা এরপর চাকরির খোঁজে পাড়ি দিতে শুরু করেছেন অন্য রাজ্যে। আর এভাবেই ধীরলয়ে শুরু হয় রাজ্যের বাইরে প্রব্রজন। যারা রয়ে গেছেন তারা অধিকারহীন প্রান্তিক অবস্থানকে মেনে নিয়েই রয়ে গেছেন। কিন্তু এই অব্দি রাজ্যে কোনো হিংসা র পরিবেশ ছিলনা। এমনকি ৬০ বা ৭০ এর দশকে যখন আসামে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদের উত্থান হয়েছে , ঘনঘন হিংসার ঘনঘটা চলছে তখনও মেঘালয় শান্তই ছিল।

এই অবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটে ১৯৭৮ সালে কে এস ইউ নামক সংগঠনটি জন্ম নেবার পর থেকেই। এরপর থেকেই তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় একের পর এক রায়ট এবং একসময় এসব মেঘালয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠে। এর শুরু ১৯৭৯ কালিপুজোর সময়ে যখন কালিমুর্তির বিসর্জনের সময় কে এস ইউর সদস্য কিছু দুস্কৃতীকারিদের সাথে বাঙালিদের গোলযোগ বাঁধে। কিন্তু এরপর যা ঘটে তা হলো পরিকল্পিত গনহত্যা এবং বাঙালিকে জাতিগতভাবে নির্মূল করার এক প্রয়াস যা অনেকদিন ধরে চলতে থাকবে নির্লজ্জ তৎকালীন সরকারের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। যতটা নিষ্ঠুরতা এবং হিংসা এই সময়ে সংগঠিত হয়েছে তা মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনাগুলোর সাথে তুলনীয় হয়তো ব্যাপ্তি কম এটুকু বলা যেতে পারে।

এই দাঙ্গার পরবর্তীতে দলে দলে বাঙালিরা রাজ্য ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন সেই সবকিছু ছেড়ে, যা তাদের পুর্বজরা, ভালোবাসা দিয়ে, একাত্মতা দিয়ে শ্রম দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন। এই যাত্রার ইতিহাস হয়তো অলিখিত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ভাবে তা মনে করিয়ে দেয় স্বভূমি ছেড়ে কাশ্মীরী পন্ডিতদের পালিয়ে আসার ঘটনাপর্বকে। বিস্ময়কর ভাবে কিন্তু এই পুরো পর্বের জন্য একটি লোকেরও কোনো শাস্তি হয়নি উল্টে কে এস ইউর নেতা পল লিংডো পরবর্তীতে রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়, খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এরপর বারবার দাঙ্গা সংঘটিত করেছে। ১৯৮৭ র দাঙ্গার লক্ষ্য ছিল নেপালী জনগোষ্ঠী যার ফলশ্রুতিতে প্রায় বছরব্যাপী কার্ফু বলবৎ ছিল এই পাহাড়ি রাজ্যটিতে। শতশত মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে বিভিন্ন স্কুলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, কারন তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের অবস্থা ও কাশ্মীরের পন্ডিতদের দুর্দশাকে মনে করিয়ে দেয়। ১৯৯২ তে আবার বড় দাঙ্গা, এবার বিহারী দের বিরুদ্ধে। এদের অধিকাংশই গোপালন এবং দুধের ব্যাবসা করতেন। তাদের গরুকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মাড়োয়ারি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি - কোনো অনুপজাতি জনগোষ্ঠীই কে এস ইউ সদস্যদের রোষ থেকে বাঁচতে পারেনি। এই তো ২০১৮ সালেও দাঙ্গা হয়েছে পাঞ্জাবি দলিতদের লক্ষ্য করে। আজ অব্দি কিন্তু কোনো দুস্কৃতীকারীর শাস্তি হয়নি এসবের জন্য। যে কয়টি এফ আই আর এখন অব্দি দাখিল হয়েছে সবখানে দুস্কৃতীকারীর একটি পরিচয়ই লিখিত হয়েছে - "অপরিচিত আততায়ী"

কে এস ইউ আগে পোস্টার সাঁটতো যাতে লেখা থাকতো - **'We are Khasi by birth & Indian by accident'**। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে যদি রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে তাদের জন্য বরাদ্দ জোরদার আর্থিক অনুদান একমাসের জন্যও বন্ধ হয় তবে রাজ্যের কাজকর্ম সব অবিলম্বে স্তব্ধ হয়ে পড়বে কারন মেঘালয় থেকে যা রাজস্ব উৎপাদিত হয় তা দিয়ে রাজ্যের মোট ব্যায়ের মাত্র ২০ শতাংশ চলতে পারে। যে মূল ভুখন্ডের ভারতীয় দের তারা **'Indian Dogs'** বলে সম্বোধন করে তাদের ট্যাক্সের টাকায়ই বা তারাই রাজ্যের ৮০ শতাংশ ব্যায়ভার বহন করে চলেছে। রাজ্যের ৮০,০০০ সরকারি চাকুরেদের বেতন-ভাতা দিতে গিয়ে যা খরচা হয় তা তার নিজস্ব রাজস্বের দেড় গুণ। পুরো প্রক্রিয়াতেই সার্বিক অসাম্য লক্ষ্যনীয় ভাবে প্রকট। যেখানে সিক্সথ্ শিডিউল এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের আয়কর দিতে হয়না, তা তাদের যতই আয় হোক না কেনো, সেখানে কেন্দ্রীয় রাজস্বখাত থেকে রাজ্যকে ৩০,০০০ কোটির উপরে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। অথচ রাজ্যটির মোট রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ৩০০০ কোটি টাকা। **(ভিত্তিবর্ষ - ২০২০-২১)**

খাসি নাগরিক সমাজের সবাই যে এইসব জাতিবিদ্বেষ বা হিংসা কে সমর্থন করেন তা মোটেই নয় কিন্তু লক্ষ্যনীয় ভাবে চুপচাপ থাকেন, হয়তো বা ভয়ে। সরকার পক্ষ কে এস ইউ কে নিয়ে হাসাহাসি করেন কিন্তু তাদের সন্ত্রাস এবং দুস্কর্ম চোখের সামনে দেখেও স্পিকটি নট হয়ে থাকেন। এবং রাজ্যের অনুপজাতি বাসিন্দারা সর্বদাই ভয়ের পরিবেশে দিন কাটাচ্ছেন কারন তারা জানেন যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে তাদের উপর কে এস ইউ বা অন্যান্য উপজাতি ছাত্র সংগঠনের খাঁড়া নেমে আসতে পারে। তখন কেউ তাদের বাঁচাতে আসবেনা , প্রসাশন কে বলেও লাভ হবেনা কারন আইনের শাসন নয় , এই পাহাড়ি রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে।

(C) Ishan Kotha